

Vol. 52 | No. 2 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্পে নদী-দর্শনের পাঠ বিশ্লেষণ

Volume	52
Issue	2
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মিথুন ব্যানার্জী
Published online	February 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i2.8
Pages	১১৯-১৩২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্পে নদী-দর্শনের পাঠ বিশ্লেষণ

Check for updates

মিথুন ব্যানার্জী*

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্পে ব্যবহৃত নদী-অনুষঙ্গ মূলত একের মধ্যে বহুভাবে নদীকে দেখা। নদী নিয়ে আমাদের প্রত্ন-ধারণাসমূহ তাঁর গল্পসূত্রে নতুনভাবে মূল্যায়িত হয়। যেখানে নদী শুধু নদী হয়ে থাকে না, হয়ে ওঠে জীবনসূচক; কখনো আবার জীবনের আখ্যান-চিহ্ন। তাই প্রবন্ধের শিরোনামায় 'নদী-দর্শন' শব্দযুগলটি বিশেষভাবে নদীকে দেখা ও একই সাথে নদীর দার্শনিক রূপ অনুধাবনের প্রয়োজনে গৃহীত হয়েছে। ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর বহুস্তরবিশিষ্ট শিল্পপ্রকৌশলে আমাদের অনুভবে নদীকে বিশেষ মাত্রায় দ্যোতিত করেন। তাঁর পরিবেশনা-কৌশল আমাদের সামনে বর্ণিল ও বিচিত্র জীবন-নাট্যের পর্দা তোলে। এই জীবন-নাট্যের বিশাল উন্মুক্ত মঞ্চে যে কুশীলবদের আগমন ঘটে নদী শুধু এদের জীবন-রথই নির্দেশ করে না কখনও কখনও ফুটিয়ে তোলে বির্মূত মনোপথেরও মূর্ত প্রতিচ্ছবি। ওয়ালীউল্লাহ্‌র কৃতিত্ব এখানেই যে, তাঁর গল্পের গতিপথ নদীকে অনুসরণ করে বিকশিত নয়, বরং অনেক বেশি জীবন-আশ্রিত হয়ে নদীর মতো রূপান্তরিত। তাই এদের কাহিনি-বিন্যাস ও চরিত্র-সৃজন থেকে শুরু করে, বিভিন্ন অলংকারে কিংবা চিত্রকল্পে নদী প্রসঙ্গ এসেছে বারংবার। ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্প পাঠে শেষ পর্যন্ত এই বোধটি সক্রিয় থাকে যে, নদীর একটি দার্শনিক রূপ আছে। এই দার্শনিক রূপটিই ক্রমশ অনিবার্যভাবে হয়ে ওঠে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্পের অন্যতম প্রেরণা; যা একইসঙ্গে জাগ্রত থাকে বিভিন্ন চরিত্রের অস্তিতের প্রতীক হয়ে। গল্পকার এখানে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের আর্থ-সামাজিক সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে তাঁর গল্পের প্লট রচনা করেন। তিনি এই ভৌমিক অধিবাসীদের জীবনপ্রবাহের নানা দিক ও মনোবাস্তবতার শিল্পরূপায়ণ সম্পন্ন করেন আত্মজিজ্ঞাসার প্রণোদনায়। বর্তমান আলোচনা ওয়ালীউল্লাহ্‌র নদী-ভাবনার কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ আলোকপাত নয়; এই বিষয়ক চিন্তার একটি প্রস্তাব মাত্র। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দুটি গল্পগ্রন্থ *নয়নচারা* এবং *দুই তীর ও অন্যান্য গল্প* এই আলোচনার পর্যবেক্ষণ-সীমা; যদিও একথা অনস্বীকার্য যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টিতেই নদী এক বিশেষ স্থান জুড়ে রয়েছে। তাঁর শেষ দুটি উপন্যাস *চাঁদের অমাবস্যা* ও *কাঁদো নদী কাঁদো* প্রসঙ্গেও একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য; তবে তা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয় হতে পারে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য প্রমাণের লক্ষ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছোটগল্পে নদীকে কীভাবে দেখেছেন তা আলোচনা করার পূর্বে দর্শন-শাস্ত্রে 'নদী' অভীধাটির তাৎপর্য বিবেচনা করা প্রয়োজন।

২.

দর্শন-সম্পর্কিত শৃঙ্খলায় 'নদী' ধারণাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। নদী বিষয়ে গ্রিক দার্শনিক হিরাক্লিটাস যা বলেছেন তার ভাবানুবাদ অনেকটা এরকম : মানব জীবন নদীর

* প্রভাষক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মতো। এর চূড়া ও তল জলপ্রবাহের মতোই, রয়েছে তার সরল ও সর্পিল গতিমুখ। যা নদীর যাত্রা পথেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ (দ্র. Kahan, 1979)। দার্শনিক হিরাক্লিটাসের এই অপূর্ব নদী-ভাবনা প্রভাবিত করেছিল পরবর্তীকালের দার্শনিকদেরও। সক্রেটিসের বরাত দিয়ে হিরাক্লিটাসের এই চিন্তাকে প্লাটো (Plato, 1871) যেভাবে তুলে ধরেছেন তার মূল কথা হলো, সব বস্তুরই রয়েছে গতি এবং তা নদীর স্রোতের সঙ্গেই তুলনীয়। এই নদী-ভাবনা একের মধ্যে বহুর ব্যঞ্জনাসঞ্চারী; কেননা, মানবজীবন-পথে অভিন্ন নদীতে কখনও দুবার যাওয়া যায় না — এই ছিল হিরাক্লিটাসের বিশ্বাস। প্রকৃতপক্ষে তিনি নদীর রূপকাশ্রয়ে স্বোপার্জিত দার্শনিক তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। মূলত, তিনি বিশ্বের প্রকৃতি এবং এর ক্রমাগত পরিবর্তনমুখীনতাকে শনাক্ত করেছেন তাঁর নদী-ধারণায়। দার্শনিক ভিটগেইনস্টাইনও (Wittgenstein, 1953) দর্শন আলোচনায় হিরাক্লিটাসের এই নদী-ভাবনা দ্বারা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি মানবজীবনের প্রতিকারহীন অনিশ্চয়তাবোধকে প্রবাহের মধ্যে অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়েছেন।

নদীর এই রূপকার্থ-প্রয়োগ কেবল পাশ্চাত্যে নয় প্রাচ্যের একাধিক দর্শন ধারাতেও লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ দর্শনে সিদ্ধার্থ যখন জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে বাসুদেবকে প্রশ্ন করেন, তখন সেই প্রশ্নেরও উত্তর মেলে এভাবে : জীবন নদীর মতোই সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে; সুউচ্চ পর্বতমালা থেকে মহাসাগরে। তবে এই বিক্ষিপ্ত অবস্থার মধ্যে নদীর অস্তিত্ব তার বর্তমানে, অর্থাৎ সে নিজেকে যেখানে অনুভব করছে। একইভাবে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে বর্তমানে, অতীত বা ভবিষ্যতে নয় (দ্র. Hermann, 1922)। একইভাবে আমাদের লোকায়ত ও দেশজ ভিন্ন দর্শন-ধারায়ও নদীকে তত্ত্ব ব্যাখ্যার বিশেষ পরিভাষারূপে ব্যবহার করতে দেখা যায়। চর্যাকার থেকে শুরু করে মরমি বাউল সকলেই 'নদী' কে অভিহিত করেন গভীরতাসঞ্চারী বিবিধ ব্যঞ্জনায়। ভুসুকু পা যে পদ্মানদী পাড়ি দিয়ে বাঙালি হতে চান তা আমাদের পরিচিত নদী-ভাবনাকে অনার্য জীবনবীক্ষার স্মারক করে তোলে। আবার বাউল সাধনায় গুরুকে কাণ্ডারী করে দেহতরী নিয়ে যে ভবনদী পাড়ি দেওয়ার কথা বলা হয় তখনও নদীকে তার আক্ষরিক অর্থের বাইরে উপস্থাপন করা হয়। দরদি মন নিয়ে লোকায়ত মানুষকে সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে নির্ধারণ করলেও ওয়ালীউল্লাহ্ প্রত্যক্ষভাবে দেশজ ভাববাদী দর্শন কিংবা বাউল তত্ত্বের প্রয়োগ তাঁর গল্প উপন্যাস কিংবা নাটকে করেছেন এমন নয়; তবে তাঁর হৃদয়ের অন্তঃসলিলে এরূপ লোকজ দার্শনিক বোধের ভেসে চলা অসম্ভব না-ও হতে পারে। অবশ্য পাশ্চাত্য দর্শন ও চিত্রকলার প্রতি তিনি সচেতনভাবেই আগ্রহী ছিলেন (আনা মারি, ২০১২ : ৪৫-৪৬): যা থেকে তাঁর নদী-ভাবনা সম্পর্কশূন্য ছিল না। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা 'নদী' অভিধার এই বহুমাত্রাকে বিবেচনায় রেখে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্প বিশ্লেষণে অগ্রসর হব। তবে এর পূর্বে বাংলা কথাসাহিত্যে নদীর যে ব্যাপক ও বিচিত্র ব্যবহার রয়েছে সে সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

৩.

বাংলা কথাসাহিত্যে নদীর কেন্দ্রীয়, প্রান্তিক অথবা পরিপ্রেক্ষিতধর্মী উপস্থিতি দুর্লভ নয়। বিভিন্ন কথাশিল্পে বহুমাত্রিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে নদী-অনুষঙ্গ। ওইসব রচনায় নদী কখনো

নদীজীবীদের প্রাণ, কখনো তাদের জীবন-আখ্যানের বীজসূত্র, যা ছড়িয়ে পড়ে ওই মানুষগুলোর বৈশিষ্ট্যে-আচারে-কৃষ্টিতে। নদীভিত্তিক যেসব উপন্যাস রয়েছে তার শিরোনামা থেকে শুরু করে কাহিনি-চিত্রণ, সূচনা থেকে শুরু করে পরিণতি পর্যন্ত সর্বত্রই নদীর সরব উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, *পদ্মা নদীর মাঝি*, *গঙ্গা*, *তিতাস একটি নদীর নাম*, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*-সহ বিভিন্ন উপন্যাসে বিধৃত নদী-আখ্যানের কথা। এসব উপন্যাসের নামকরণ থেকে শুরু করে পুরো আখ্যানেই কেন্দ্রীয় মনোযোগে আবদ্ধ থাকে নদীর অবস্থান; নদী-বাস্তবতার প্রেক্ষণবিন্দু থেকেই এসব আখ্যানের সঞ্চারপথ পূর্ণতাপ্রাপ্ত। কিন্তু এই কেন্দ্রীয় মনোযোগের প্রশ্নেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একেবারেই সবিশেষ ও স্বতন্ত্র। তাঁর সাহিত্য নদীভিত্তিক নয় (*কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসকে স্মরণে রেখেও এ কথা বলা চলে)। নদীকে তিনি ব্যবহার করেন তাঁর বিশ্বাস ও বোধকে শিল্পিতভাবে উপস্থাপনের জন্য; নদী-চিত্র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের বক্তব্য ও ভাবকে এবং ভাষাকে পূর্ণতা প্রদান করেন। কোনো পরিচর্যারীতির কৌশল হিসেবে নয়, তিনি তাঁর ছোটগল্পে নদীকে উপস্থাপন করেন চেতনা প্রকাশের বাহন হিসেবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, "পোস্টমাস্টার", "অতিথি", "ছুটি" প্রভৃতি ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নদীকে সরাসরি ব্যবহার না করে পরিচর্যারীতির কৌশল হিসেবে কাজে লাগিয়েছিলেন। রতনের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে পেছনে রেখে পোস্টমাস্টার বাবুর নৌকার পালে যখন হাওয়া লাগে; তখন নদী হয়ে ওঠে জীবন-গতির প্রতিরূপক। আর জীবনের এই গতি বা টানকে অগ্রাহ্য করা যায় না বলেই কথাশিল্পী বলে ওঠেন, 'পৃথিবীতে কে কাহার'। আবার "ছুটি" গল্পে ফটিকের অস্তিমযাত্রাকে জীবন-নদীর অতলান্তিক রহস্যের বাতাবরণে ; জল মাপার মধ্য দিয়ে লেখক তুলে ধরেছেন :'এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে না–এ–এ না'। আমাদের আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌র বিভিন্ন গল্প বিশ্লেষণের সময় এ বিষয়টি ক্রমেই স্পষ্ট হবে।

৪.

পূর্বেই বলা হয়েছে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নদী-দর্শন শৈল্পিকতায় চিহ্নিত। যুগপৎ এই অনুষঙ্গটি অনন্যও বটে। এর কারণ হলো, তাঁর কথাশিল্পে নদীর সঙ্গে মানুষের বস্তু-পৃথিবীর প্রত্যক্ষ কার্যকারণ-ভিত্তিক সম্পর্কটি অস্পষ্ট; অনেকটা অগোচরে এরা রচনার পাঠে বিন্যস্ত থাকে। এখানে নদী যতটা জীবনের তাগিদ তার চেয়ে বেশি মানসিকতার ধারক। নদীর সঙ্গে গল্পকার প্রায়শই মানুষের বোধ বা উপলব্ধির সাযুজ্য দেখাতে আগ্রহী হন। ওয়ালীউল্লাহ্ স্বোপার্জিত শিল্পবীক্ষা দিয়ে 'নদী'-কে কখনো মানব-প্রবৃত্তির নির্ধারক হিসেবে ব্যবহার করেন, আবার কখনো সেই নদী-কে দিয়েই জীবনের নান্দনিক শিল্পবয়ন সম্পন্ন করেন। ফলে তাঁর লেখনীতে নদীর ব্যবহার যেন বিশাল জীবন-ক্যানভাসে কুশলী শিল্পীর মতোই: কয়েকটা আঁচড়ে রেখে যাওয়া সচেতন জীবন-চিহ্ন। মানব মনের বিসর্পিল-ভঙ্গিকে জীবনকথার দার্শনিক ব্যঞ্জনায় অন্বিত করতে চেয়েছেন তিনি। তাই একথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিল্পানুভবে যেমন করে নদী ধরা দেয় তা অন্য কথাশিল্পীদের থেকে পৃথক তো বটেই, কখনো-কখনো তা একেবারেই অভিনব। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যাক *গঙ্গা* উপন্যাসের কথা; যেখানে পাওয়া যায় মোহনামুখী

নদীময় মানব-জীবনচিত্র। ওইখানে নদীকে ঘিরেই লেখকের যাবতীয় জীবন-কাহন। নদীর মনোজাগতিক গুরুত্ব থাকলেও *গঙ্গা* উপন্যাসে মুখ্য হয়ে ওঠে নদীকেন্দ্রিক জীবন-সংগ্রাম। আবার *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে নদীর আশ্রয়ে মানব-মনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, প্রবৃত্তির বিক্ষেপ, মানবিকতার টানাপড়েন প্রভৃতি সুস্পষ্ট হয়। *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে পাই গোষ্ঠীজীবনের সংহিতা। লেখকের অপূর্ব নির্মাণদক্ষতায় তিতাস-আখ্যানে উন্মোচিত হয় জলজীবী-সংস্কৃতির সাতকাহন। লক্ষণীয়, এখানে তুলনীয় প্রায় প্রতিটি নদীর-ই রয়েছে সুনির্দিষ্ট ভূগোলচিহ্নিত অবস্থান। কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে-সব নদীর কথা বয়ান করেন তা নামহীন। চিত্রকলার রং যেমন অনুভবের দ্যোতনা জাগায়, সেরকম ওয়ালীউল্লাহ্-র মানস প্রবণতার ধারক হয়ে ওঠে নদী। তাঁর গল্পগুলোতে নদীকেন্দ্রিক সংগ্রাম, নদীর উদ্দাম-উত্তাল রূপটি আমরা পাই না। নদী এখানে সাধারণভাবে বহমান কারণ ওয়ালীউল্লাহ্র চিন্তাও বহমান। শিল্পীর লক্ষ্য নদীর অবয়ব নয়, এর স্বভাব। নদীর পরিচয় এখানে যতখানি ভূগোলচিহ্নিত তার চেয়ে অনেক বেশি মানস-নির্দেশিত। তাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র গল্পে ব্যবহৃত বেশিরভাগ নদীর নাম শুধুই নদী। নদী হওয়াটাই তার চূড়ান্ত সত্য পরিচয়।

৫.

নদীর সঙ্গে মানব-স্বভাবের সাযুজ্য মেলে ''কেরায়া'' গল্পে। গল্পটির শেষের উদ্ধৃতিটি শুরুতেই বুঝে নিলে আমাদের আলোকপাতে সুবিধা হবে। "কেরায়া" গল্পের শেষে লেখক বলেন*, 'নৌকার দুপাশে নদী ছলছল করে' (পৃ. ৮২)। নৌকা যেন এখানে জীবনাবেগ আর নদীর মানবীয় অনুভববেদ্যতার মেলবন্ধন, বেঁচে থাকার গতি-শর্ত। "কেরায়া" গল্পে তাঁর এ সচেতন শিল্পপ্রয়াসে অনায়াসেই নদী পেয়ে যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান। নদী এখানে শুধু স্থাবর আকর নয়, হয়ে ওঠে প্রতীক; পাঠকের মনে আলোড়ন তুলে তা সৃষ্টি করে এক শুদ্ধসত্তা-অভিসারী মানবতার অনুভবমুখরতা। গল্পের শুরুতে দেখা যায় নৌকার মাঝিরা ও তাদের নৌকায় আশ্রিত এতিম বালক এক মহাজনের জন্য অপেক্ষা করছে। এই অপেক্ষা যখন গল্পের আখ্যানে অ্যাবসার্ড আবহ তৈরির সম্ভাবনা জাগায়, তখনই লেখক বেশি করে বাস্তবে ফিরে আসেন। মহাজনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কাহিনি তখন গল্পের ক্লাইম্যাক্সের প্রেক্ষাপট রচনা করে। মাঝিদের গুড়ের কেরায়া হিসেবে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেছে যে মহাজন; তিন দিন ধরে তার দেখা মেলে না। এদিকে মাঝিদের ঘরে খাবার নেই, কিন্তু এরই মধ্যে তাদের নৌকায় এক মুমূর্ষু বৃদ্ধের আর্বিভাব ঘটে। রাতে বৃদ্ধ মারা গেলে, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে শুভবোধে উত্তীর্ণ মাঝিরা সেই বৃদ্ধের লাশ তার গ্রামে পৌঁছে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং নৌকা ছেড়ে দেয়। প্রসঙ্গত নিচের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য :

> তারা নৌকার নোঙর তুলে নেয়। মরা তেলাপোকার গায়ে অসংখ্য পিঁপড়ের মতো অসংখ্য নৌকা নদীর তীরে আঁকড়ে পড়ে আছে। তাদেরই মধ্য থেকে একটা নৌকা তীর হতে খসে পড়ে। দিগন্তের ওপার থেকে পয়গম্বরের এবং মানুষের খোদা যদি সেসময়ে উঁকি মেরে দেখতেন তখন তাঁরও মনে হত তেলাপোকার মৃতদেহ ছেড়ে একটি পিঁপড়েই বুঝি খসে পড়েছে। (পৃ. ১০৪)

এখানে নদীকে মৃত তেলাপোকা এবং নোঙর করা নৌকাগুলোকে তেলাপোকার মৃতদেহ আকড়ে পড়ে থাকা পিঁপড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই গল্পের কেন্দ্রে একটি মৃত্যুর ঘটনা রয়েছে; রয়েছে একজন মৃত ব্যক্তির নিজ গৃহে সমাহিত হওয়ার বাসনা। তাহলে কি এই মৃত তেলাপোকাটা অতি সন্তর্পণে মৃতদেহের প্রতীক হয়ে উঠেছে? আবার চিত্রকল্পটিতে আক্ষরিকভাবে বলাই হচ্ছে মৃত তেলাপোকাটা নদী। কিন্তু গল্পের কোথাও এই আভাস নেই যে, নদীটা মৃত। তবে মৃত মানুষ আর নদী কি একাকার হয়ে যায়! মৃত তেলাপোকা পিঁপড়ের খাদ্য — এই খাদ্য গ্রহণ করে মৃতজীবী পিঁপড়েগুলো বেঁচে থাকছে। ঠিক একইভাবে এই নদীও নৌকাগুলোর জীবন। আর মাঝিরা কেরায়াজীবী। এই কেরায়া তাদের জীবনের অবলম্বন। কিন্তু মানবিক দায়িত্বে মৃতদেহের সৎকারের কথা ভেবে তারা কেরায়া ছাড়াই নৌকা ছেড়ে দেয়। এখানে লেখক দূরবীক্ষণ দৃষ্টি প্রয়োগ করেছেন। নদীকে তেলাপোকার সঙ্গে তুলনা করলেও নদী মৃত নয় কিন্তু বহন করছে মৃতদেহ। এখানে জীবন আর মৃত্যু যেন হাত ধরে চলে। তাদের গতকালের খিদের সঙ্গে সারা জীবনের খিদেটা ফিরে আসলেও তারা লাশটা পৌঁছানোর দায়িত্ব থেকে সরে আসে না। আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে, এই মাঝিরা 'শুভবোধ' প্রত্যাশী। ওয়ালীউল্লাহ্-পত্নী অ্যান ম্যারি (আন মারি, ২০১২ : ৬৩) যখন ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিল্পজিজ্ঞাসা বিষয়ে 'পরিচ্ছন্ন মানুষ' ('He often said he wanted to write about a clean man')-এর কথা আমাদের জানান তখন একমুহূর্তের জন্য মনে হয়, এই মাঝিরা কি তার সেই পরিশুদ্ধ মানবসত্তা! গল্পের শুরুতে তাই হয়ত লেখক মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ লোকটির নৌকায় এসে ওঠাকে ভীষণাকার জন্তুর তাড়া খেয়ে প্রাণের ভয়ে মাছদের জেলে নৌকায় ওঠার সাথে তুলনা করেন :

> জানের ভয়ে মাছ যখন নৌকায় লাফিয়ে ওঠে, তখন জেলে সে-মাছ চুবড়ির মধ্যেই ভরে। ভেবে দেখে না মাছটা কেন লাফিয়ে উঠল হঠাৎ। তাছাড়া এরা জেলে নয়, কেরায়া নৌকার মাঝি। (পৃ. ১০০)

যদিও এই বৃদ্ধলোকটি মাঝিদের আত্মীয়-কুটুম্ব নয়, এতিম (!) ছেলেটিরও কেউ নয়; তবু মানবিকতার তাগিদে মাঝিরা এই দেহ বহন করে নিয়ে যায় বৃদ্ধের গ্রামে। কেরায়া না পাওয়ার হতাশা, অর্থ ছাড়া শূন্য হাতে বাড়ি যাওয়ার অবশ্যম্ভাবী শঙ্কাকে দূরে রেখে মানুষ-সত্তাই বড় হয়ে ওঠে তাদের কাছে। এই লাশটি তারা বহন করতে না-ও পারত। কিন্তু এরা জেলে নয়, কেরায়া নৌকার মাঝি। এজন্যই তারা ভেবে দেখে কেন লোকটি তাদের কাছে এসেছে। এই মাঝিদের সত্তায় নদী জাগ্রত বলে তারা জীবন-মৃত্যুর মধ্যকার ব্যবধানকে আয়ত্ত করতে পারে। তারা অনায়াসে মৃত মানুষের গাঁ ঘেষে শুয়ে পড়তে পারে। নদীই এখানে জীবন ও মৃত্যুকে মীমাংসিত করেছে। কেরায়া নৌকার মাঝিরা নদীকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। তাই তারা নদীকে ধারণ করে নিজেদের অংশ হিসেবেই। এবং গল্পটি মৃতের গল্প না হয়ে ক্রমশ জীবনের গল্প হয়ে উঠেছে। সামগ্রিক বিবেচনায় কেরায়া গল্পে লাশ বহন করে নিয়ে যাওয়া এই নদী অভিযানই পাল্টে দিয়েছে জীবন-মৃত্যুর সংজ্ঞার্থ।

> এক সময়ে ঘুমিয়ে-থাকা লোকটি এসে হাল ধরে, এবং যে খালাশ পায় সে তেমনি মৃতদেহের প্রায় গা-ঘেঁষে শুয়ে পড়ে। তার ঘুম আসতে দেরি হয় না। এবং এবার যে বাইরে থাকে সে ভাবে, ছই-এর তলে দুটি মানুষ যেন ঘুমিয়ে। তারপর মনে হয়, দুজনেই মরে পড়ে আছে। (পৃ. ১০৪)

এই নদীযাত্রায় জীবন্ত ও মৃত মানুষের মধ্যকার ব্যবধান ঘুচে যায়। মাঝিদের জন্য নদীযাত্রা নতুন কিছু নয়। তারা নদী দিয়ে কেরায়া যেমন বহন করে তেমনি লাশও বহন করছে। কিন্তু তাদের প্রতিবারের যাত্রায়ই কি নদী অভিন্ন থাকছে? এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় দার্শনিক হিরাক্লিটাসের সেই উক্তি 'অভিন্ন নদীতে কখনও দুইবার যাওয়া যায় না'। নদীর জলপ্রবাহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গিয়েছে নদী আর এই নদী পরিবর্তন প্রভাব বিস্তার করেছে মাঝিদের জীবনে ও মননে। তাই প্রতিবার মাঝিরা নতুন নদীতে তাদের যাত্রা শুরু করে। আর শুরু করে তাদের জীবনের গল্প।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিল্পরচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো চেতনাপ্রবাহরীতির আঙ্গিকে নদীকে স্ব-মহিমার বাইরে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করা। এখন প্রশ্ন হলো, চেতনা-প্রবাহরীতি মানব মনের কোন বিশেষ স্তর, যেখানে নদী এমনভাবে স্থাপিত হতে পারে! কোনো বিশেষ ঘটনা-পরম্পরায় মানব মনের উপলব্ধি বা বোধের মগ্নতার সাথে যখন তার স্মৃতি যুক্ত হয়, তখন যে বিশেষ অবস্থার উন্মেষ ঘটে তা-ই চেতনাস্রোত (James, 1890)। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, ইন্দ্রিয়বোধের সঙ্গে স্মৃতির একান্ত বা অবিরাম প্রবাহ হলো চেতনাস্রোত। এর ফলে স্মৃতির একধরনের উল্লম্ফন ঘটে থাকে। কারণ এই মগ্নতার কোনো ধারাবাহিকতা থাকে না। এতে অতীতে যাওয়া-আসার কাজটি এত দ্রুত ঘটে যে, ব্যক্তি সজ্ঞানের সীমার মধ্যে থেকেও এক অস্পষ্ট অবচেতনে প্রবেশ করে। এক ধরনের স্বপ্ন ও বাস্তবতার মিশেলে নির্মিত হয় তার বোধ। তাই আমরা বলতে পারি, মানুষের ভাবনাসূত্রে যখন অবচেতন, সচেতন এবং প্রাক্-চেতন মানসিকতা জাগ্রত থাকে এবং ফ্ল্যাশব্যাকের মতো নিজের মনে মানুষ পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার ছায়া দেখতে পায় তখন তাঁর অস্তিত্বে চেতনাপ্রবাহরীতি সক্রিয় হয়। এই চেতনাপ্রবাহ অনেক সময় মানুষকে বর্তমানের অপূর্ণতার মধ্যেও বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। সে তার অতীত জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যটুকু ভাবতে পারে বলে বর্তমানকে ইতিবাচক করতে পারে। আবার এভাবেও বলা যায় (James, 1890), চেতনাপ্রবাহ মানব মনের এমন এক নিরবচ্ছিন্ন প্রসঙ্গ, যা অনেকটা নদীর প্রবাহের মতোই। এই তত্ত্ব দ্বারাই কি ওয়ালীউল্লাহ্ বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে নদীর সূত্র ধরে চেতনাপ্রবাহরীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন তাঁর ছোটগল্পে! এমন অনুমান অপ্রাসঙ্গিক নয়। এর প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, তাঁর ছোটগল্পগুলোর বিভিন্ন চরিত্র শুধু বর্তমানে বেঁচে থাকে না। একইসঙ্গে তারা অতীতের মেলবন্ধন ঘটায় চলমান ইতিহাসে। এভাবে চেতনাপ্রবাহরীতির মধ্যে নদী-ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় "নয়নচারা" গল্পে। "নয়নচারা" গল্পের পটভূমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও এর উপজাত মন্বন্তর। গ্রাম থেকে শহরের দিকে ছুটে আসছে ক্ষুধা-কাতর মানুষেরা। এই মানুষদের একজন হলো আমু: আমজনতার প্রতিনিধি সে। লেখক আমুর মধ্যে দুর্ভিক্ষ-কবলিত হাজারো মানুষের বেঁচে থাকাকে শনাক্ত

করতে চেয়েছেন। আমুর পেছনে ফেলে আসা গ্রামের নাম 'নয়নচারা'। আমুর আশা ও আশ্রয় এই নয়নচারা গ্রাম, বারংবার ফিরে যাবার আকুতি এই গ্রামে। নয়নচারা গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ময়ূরাক্ষী নদী। এই নদীও একইভাবে প্রভাবিত করে আমুর বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তকে। আমু যখনই বেঁচে থেকে মানবীয় উষ্ণতার স্পর্শ পেতে চায়, তখনই সে ময়ূরাক্ষীর শরণাপন্ন হয়। এই দয়ামায়াহীন শহরে দুর্ভিক্ষের কালবেলায় আমু টিকে থাকে ময়ূরাক্ষীর স্মৃতি সঞ্চয় করে, সম্বল করে। তাই বারংবার অতীতে অবগাহন আমুর বর্তমানের রূঢ়-বাস্তবে টিকে থাকার রসদ হিসেবে কাজ করছে। আমু চেতনাপ্রবাহের অনুষঙ্গে ময়ূরাক্ষী নদীকে ফিরে পায় তার উপলব্ধিতে। নগরের কালো রাস্তাকে ক্ষণকালের জন্য আমুর কাছে ময়ূরাক্ষী বলে মনে হয়। এই গল্পে নদীর নাম উল্লেখিত হলেও তা কিন্তু কেবল একটি নদী নয়; বরং আমুর মতো সকল মানুষের চেতনায় জেগে থাকা জীবন-প্রতীক। লেখক এ গল্পে মূলত আমুর সত্তার সারথি করে ব্যবহার করেছেন নদীকে। তাই "নয়নচারা" গল্পে নদীকে পাওয়া যায় কখনো স্বপ্নবাস্তবতায়, আবার কখনো অন্তর্বাহী চেতনাস্রোতে।

> ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে ময়ূরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে। কিন্তু মনের চরে যখন ঘুমের বন্যা আসে, তখন মনে হয় ওটা সত্যিই ময়ূরাক্ষী : রাতের নিস্তব্ধতায় তার কালো স্রোত কল-কল করে, দূর আঁধারে ঢাকা তীররেখা নজরে পড়ে একটু-একটু, মধ্যজলে ভাসন্ত জেলেডিঙিগুলোর বিন্দু-বিন্দু লালচে আলো ঘন আঁধারেও সর্বংসহা আশার মতো মৃদু মৃদু জ্বলে। (নয়নচারা; পৃ. ৫)

ঘুমাচ্ছন্ন শহরের মৃদু বর্ণিল আলোকচ্ছটা তাদের আভা দিয়ে আমুকে ময়ূরাক্ষীর কাছে নিয়ে যায়। নিকষ কালো রাতে প্রশস্ত রাস্তাটা যখন আমুর কাছে নদী, তখন নদী যেন সেই পথ, যে পথ আশার দীপাবলি জ্বালিয়ে রাখে। রাতের নিস্তব্ধতায় জীবনের স্রোতধারার কল্লোল শুনতে পায় আমু। যদিও এই তমসার কোনো কূল-কিনারা নেই, তবুও আমু আবছা তীররেখা নজরে আনতে চায়। নগরের কালো রাস্তা আর ময়ূরাক্ষী একাকার হয়ে গিয়ে আমুর জীবন-রংকে আলো-ছায়ার বৈপরীত্যের অংশ করে তোলে (সৈয়দ শাহরিয়ার, ২০১৪)। আমুর মনে হয়, জেলে ডিঙিগুলোতে যে আলো তা ঘন আঁধারেও সর্বংসহা আশার মতো জ্বলছে। আমুর কষ্টজর্জর জীবনের স্বস্তি এই নদী। এই মৃদু লালচে আলো আমুর জন্য নদীর দেখিয়ে যাওয়া জীবন পথ কিংবা 'বাতিঘর'। এই পথ আবিষ্কার করতে চায় বলেই আমু আকাশের তারার দিকে তাকায়।

> সে ভরা চোখে তাকাল ওপরের পানে — তারার পানে, এবং অকস্মাৎ অবাক হয়ে ভাবল, ওই তারাগুলিই কি সে বাড়ি থেকে চেয়ে-চেয়ে দেখত? কিন্তু সে তারাগুলির নিচে ছিল ঢালা মাঠ, ভাঙা মাটি, ঘাস, শস্য, আর ময়ূরাক্ষী। আর এই তারাগুলোর নিচে খাদ্য নেই, দয়ামায়া নেই, রয়েছে হিংসাবিদ্বেষ নিষ্ঠুরতা, অসহ্য বৈরিতা। (নয়নচারা; পৃ.০৫)

আমু নগরের তিক্ত জীবনে স্মৃতির স্নিগ্ধ আলোয় বাঁচতে চায়। মানবিকতাশূন্য নগরে আমু যতটুকু স্নিগ্ধতার সন্ধান পায় তার পুরোটাই ময়ূরাক্ষী নদীকে ঘিরে। একারণেই আমু বারবার পেছনে ফিরে তাকায়। এই নিষ্ঠুর নাগরিক সমাজকাঠামোর মধ্যে আমুর বেঁচে

থাকার প্রণোদনা হয়ে প্রবহমান থাকে ময়ূরাক্ষী নদী। এইজন্য টিকে থাকার লড়াইয়ে আমু বারংবার তার মনোজগৎকে ময়ূরাক্ষী নদীর অভিমুখে ধাবিত করে। তাই হয়ত এতকিছুর পরেও আমু জীবনের কাছে প্রত্যাশা করে; বেঁচে থাকার আশা করে।

এভাবেই ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পের চরিত্ররা জীবনের একটা অর্থ তৈরি করে। সর্বোপরি পৃথিবীরও একটা মানে খুঁজে পায় তারা। হয়ত তা উপজাত খড় বা তেলাপোকার মৃতদেহ থেকে একটা পিঁপড়ে খসে পড়ার মতো, কিন্তু কখনই তা অর্থশূন্য নয়; যেমন করে সিমন দ্য বোভোয়ার মানব জীবনার্থ সন্ধানে স্থিত হয়েছেন (দ্র. শেফালী, ২০১১ : ৫৫) এভাবে, প্রতিটি মানুষ জগতে এসে পৃথিবীকে একটা মানে প্রদান করে 'Reinvesting it with human signification'। এই মানের মধ্যেই নিহিত থাকে তার বেঁচে থাকা, যে-কোনো প্রকারেই হোক নিজের মধ্যে পৃথিবীর অস্তিত্ব ধারণ করে এগিয়ে যাওয়া। সিমন দ্য বোভোয়ার আরও বলেন, বহিরাগত (outsider) হয়ে নয়, জীবনের ধারাবাহিকতায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে টিকিয়ে রাখা। প্রাসঙ্গিকভাবেই জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্য তারা জীবনীশক্তি, সংবেদনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা আয়ত্ত করে থাকে। স্বতঃস্ফূর্ত এই গুণাবলি দিয়েই মানুষ বেঁচে থাকার মানে এবং আনন্দ খুঁজে পায়। সামাজিক যেকোনো অবস্থায় মানুষের মধ্যকার এই গুণাবলি সক্রিয় থাকে। আর মানুষের মধ্য থেকে যখন এই গুণাবলি হারিয়ে যায় তখন সে পরিণত হয় 'অবমানুষ' বা সাব-হিউম্যানে (দ্র. বীতশোক, ২০১১)। এই সাব-হিউম্যানের বেঁচে থাকায় উষ্ণতা থাকে না, তাই সে প্যাশন-কে অস্বীকার করে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পে সচেতন মানবিকবোধ সম্পন্ন মানুষের পাশাপাশি এই অব-মানুষদের চিত্রও পাওয়া যায়। তিনি প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের এমন একটা অনুভবের মুখোমুখি দাঁড় করান, যেন মনে হয়, সবার মনের মধ্যে নদী থাকে না। কারো কারো হৃদয়ে নদী মরা খালে পর্যবসিত হয়। এই মরা খাল ওয়ালীউল্লাহ্‌র কাম্য নয়। তিনি নদী চান। অর্থাৎ আমুরা অবমানুষ হয়ে বাঁচতে চায় না। এমনকি অতি আধুনিকতার মধ্যেও তারা মানবতার অনুসন্ধান করে। নাগরিকদের কাছ থেকে যে নিষ্ঠুর আচরণ আমুরা পায়, তাতে তারা ক্ষুব্ধ হয় কিন্তু বেঁচে থাকার প্যাশন-কে অস্বীকার করে না। প্রসঙ্গত স্মরণীয় : '...শহরের এত লোক কি অন্ধ? বিচিত্র জায়গা এই শহর' (নয়নচারা; পৃ. ০৭)। এই গল্পে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের ক্ষুধার্ত শরীরমনে অদ্ভুত রসায়ন চলে। খাদ্য যখন স্বপ্ন; আর সে স্বপ্ন যখন ফেরি হয় নগরের দোকানে দোকানে, তখন সমষ্টির প্রকৃত রূপ উন্মোচিত হয়। আমুদের গন্তব্য নেই, তারা এই তথাকথিত শহুরে নাগরিকদের চিনতে চায়। কিন্তু চিনতে পারে না। একারণেই আমুর মনে হয় সবাই অন্ধ। যাদের অন্তরে নদী থাকে না তারা চোখ থাকতেও অন্ধের মতো বেঁচে থাকে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় :

> পথে নেবে আমু ভাবলে, একবার সে শুনেছিল শহরের লোকেরা অন্ধ হলে নাকি শোভার জন্য নকল চোখ পরে। দোকানের লোকটি অন্ধ-ই, আর চোখে, সে-নকল চোখ। ...কিন্তু সে-কথা যাক, আশ্চর্য হতে হয় কাণ্ড দেখে, নকল চোখ আর আসল চোখে তফাত নেই কিছু। (নয়নচারা, পৃ. ০৯)।

মানুষটির শহুরে চোখকে আমুর নকল চোখ মনে হয় এবং সে চোখের দৃষ্টিকে কৃত্রিম বলে মনে হয়। আমু অবাক হয়। আমুর কিছুই নেই, কিন্তু দৃষ্টি আছে; পাথুরে দৃষ্টি নয়। তাই

সে ভূতোকে দেখতে পায়, ভূতনিকে দেখতে পায়। এই শহরের মানুষগুলোর অনেক কিছু আছে, কিন্তু দৃষ্টি নেই। তাই তারা আমুদের দেখতে পায় না। যদিও-বা কখনো আমুরা তাদের কাছে যায়, সেই পাথুরে দৃষ্টি দিয়ে আমুদের তারা ঈক্ষণ করতে পারে না। মানুষ আর অব-মানুষের পার্থক্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে নদীকে সমাজ-রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনার আয়ুধ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বহির্বাস্তবতায় মানুষের বিবিক্ত মনের হাহাকার, অস্তিত্বের সংকট চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর "মৃত্যুযাত্রা" গল্পে। এখানে লক্ষণীয় একটি বিষয় হলো, নির্দিষ্ট কোনো চরিত্রের প্রতি লেখকের কোনো পক্ষপাত নেই (জীনাত, ২০০১)। সব চরিত্রকেই যেন দুর্ভিক্ষের ভীতি স্পর্শ করছে। তারা সবাই গ্রাম থেকে পালাতে চায়, কিন্তু নদী পার হওয়ার জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয়। অথচ তারা আর এতটুকু বিলম্বও সহ্য করতে পারছে না। এর প্রমাণ মিলবে নিচের উদ্ধৃতিতে :

> হঠাৎ কী হয়েছে তার — নদীর অপর পাড় দেখার জন্য তার [তিনুর] মনটা আকুল হয়ে উঠেছে। তার আশঙ্কা হচ্ছে — মহাসাগরের তীরে যেন বসে রয়েছে। পথ ভুল করে কি তারা সীমাহীন মহাসাগরের তীরে এসে বসেছে মরণের পারে যাবে বলে? (পৃ. ২৮)

দুর্ভিক্ষ তাদের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলেছে। এই যন্ত্রণায় তারা মানসিকভাবে বিবশ। তাই নদীর অপর পাড় দেখতে না পেয়ে তারা ভাবছে, মরণপারে যাবে বলে সীমাহীন মহাসাগরের তীরে এসে বসেছে তারা। নদী ক্রমেই নিজের অবয়ব পরিবর্তন করে বিশালতায় রূপ নেয়। গ্রামবাসী যেন এই বিশাল নদীর কাছে সমর্পিত। তাই রাত্রিটাও তাদের কাছে ভয়ংকর হয়ে উঠছে। অনাহারী মানুষগুলোর দেহ নির্জীব। দেহের এই অসাড়তা তাদের মনকেও নির্জীব করে তুলছে। তারা নিজের মনের প্রতিফলন দেখতে পায় নদীতে —

> রাত্রি এত নিস্পন্দ যে, সে — গোঙানির আওয়াজে তিনুর মনটা শিরশির করে কাঁটা দিয়ে উঠল, কিন্তু মনটাকে সে জমাট করে ভাবল নদী শিরশির করছে। তীর ঘেঁষে নদী শিরশির করে বয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণে আরেকটা কথা জাগল তার মনে, কিন্তু অত সন্তর্পণে কেন? যেন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নদী পালিয়ে যাচ্ছে — তাদের ব্যর্থতার শুষ্কতীরে রেখে পালিয়ে যাচ্ছে। (পৃ. ২৯)

এখানে লক্ষণীয়, তিনুর মনে হচ্ছে তার মনের মতো নদীও শিরশির করছে। তিনুর মনোজাগতিক বোধের অন্বেষণে লেখক ব্যবহার করেছেন নদীর অন্যাসক্ত ইমেজ-কাঠামো। রাতের নিস্তব্ধতা, চারপাশে দুর্ভিক্ষের চিহ্ন, ক্ষুধা-কাতর মানুষের মুখ, নিজেরও অন্নের অনিশ্চয়তা — আসলে এ সব কিছু থেকে তিনু মুক্তি চায়: মুক্তি না পেলে পালাতে চায়। নিজের মানসিক অবস্থা তাঁর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে তার সঙ্গে সে নদীকে যুক্ত করছে। তীরের বহু মানুষকে শুষ্করুক্ষ-তীরে রেখে নদী পালিয়ে যাচ্ছে। চলমান দুর্ভিক্ষের দায় যেন নদীরও। নদী সে-দায়কে পাশ কাটাতে চায়: পলায়নপ্রবণ মানুষের মতোই সে ভেসে চলে নতুন ঠিকানায় —

> আর যাচ্ছে সেই দেশে — যে-দেশে নদী চওড়া হয়ে দু-তীরের দিগন্তবিস্তৃত ফলন্ত ফসল ছোঁয় ছোঁয় করে নিবিড় আহ্লাদে। নদীর ওপর নীল আকাশ আর সোনালি সূর্য ঝক্‌ঝক্ করে, তার টলমল জলে নানা রঙ্গের পাল উড়িয়ে বড়-বড় ধানের নৌকা ভাসে, আর পশ্চিমা মাঝিরা ঝিমোয় — শুধু ঝিমোয় পরম সুখে। তাছাড়া হালের মাথায় ডোরাকাটা নিশান পত্‌পত্ করে, আর মাঝিদের দেহাতি গান ঢেউয়ের মাথায় ভাঙে, ভাঙতে-ভাঙতে ভেসে চলে দূরে... (পৃ. ২৯)

এখানে নদী আর নদী হয়ে থাকছে না। নদী যেন বিশ্ব-রাজনীতির টানাপড়েনের আভাস দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ওয়ালীউল্লাহ্ মানুষের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো বিশ্লেষণে যেভাবে নদীকে আশ্রয় করেছেন একইভাবে তিনি নদীকে স্থান দিয়েছেন তাঁর স্বদেশসংলগ্ন ভাবনায়। গল্পকারের ভাবনায় নদীরা পালিয়ে যাচ্ছে সেই দেশে যে দেশে নদী শীর্ণ নয়, ভরা যৌবন নিয়ে তারা প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে। আর দিগন্ত-বিস্তৃত ফসল যেন সমৃদ্ধিরই বার্তা বহন করে চলেছে। নদীর ওপরে নীল আকাশে কোনো অনিশ্চয়তার মেঘ নেই। তাই পশ্চিমা মাঝিরা পরম সুখে ঝিমাতে পারে। অথচ নদীটা পশ্চিমা মাঝিদের নয়। এই নদীটা পুবের তীরভরা মানুষকে ব্যর্থতার শুষ্কতীরে রেখে পশ্চিমা মাঝিদের এখানে এনেছে। প্রাচ্যের জ্ঞান-সম্পদ আত্মসাতের এই পশ্চিমা ইতিহাসকে এমন পরোক্ষে মর্মস্পর্শী আবহে উপস্থাপন একজন সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর শিল্পীর পক্ষেই কেবল সম্ভব। তাই সর্বজ্ঞ গল্পকারের মনে হয় : 'কিন্তু এখানে অন্ধকার, মরা নদীর খোলস, আর স্তব্ধতা ("মৃত্যুযাত্রা", পৃ. ২২)।' তাঁর বিস্ময় জাগে, দুর্ভিক্ষপীড়িত এই মানুষগুলোর সঙ্গেও নদীর কেমন দ্বৈতাচরণ। কোনো দেশ ফুলে-ফসলে সমৃদ্ধিতে পূর্ণ, আর কোনো দেশ বুভুক্ষু মানুষের অসহায়ত্বে কাতর। এখানের জমাট আঁধার কেবলি তীব্র হয়। কোনো আলো জ্বালানো সম্ভব হয় না। কেননা মরা নদীর খোলস আর স্তব্ধতা দিয়ে আলো জ্বালানো যায় না। সমকালের সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই বোধই তাকে স্বকালপ্রজ্ঞ করেছে। ওয়ালীউল্লাহ্ যেন কালদ্রষ্টা হয়ে দেখেছেন স্বদেশের সকরুণ বাস্তব চিত্র। "মৃত্যযাত্রা"-র এই দৃশ্যকল্পে যতই মাঝিদের দেহাতি গান থাকুক না কেন তা আমাদের বাংলার লোকজ ভাটিয়ালি গানের স্মৃতি-অনুভবকে জাগরূক করে না বা কোনো বাউল দর্শন এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় না। ভবনদীর পরলোক-অভিমুখী যাত্রার সঙ্গী হতে ওয়ালীউল্লাহ্ উৎসাহিত হন না, বরং নদীকে ঘিরে বেঁচে থাকা মানুষের আঁকাড়া বাস্তব তাঁর অনুভবকে আন্দোলিত করে। এই মন্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়, স্বদেশের মানুষ সম্পর্কে যখন ওয়ালীউল্লাহ্ আন মারিকে (২০১২) বলেন : '... যখন কোনো নগ্নপদ দরিদ্রকে দেখি কোনো নিরাপত্তা নেই, আরাম আয়েশ বলে কিছু নেই, মূর্খ, ভগ্নস্বাস্থ্য — আমি আহত বোধ করি। তারা আমাকে কতটা কষ্ট দেয়, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না (পৃ. ৩৮)'। তাই একথা দ্বিধাহীনভাবেই বলা চলে যে, এদেশের সাধারণ মানুষ তাঁর সৃষ্টির অন্যতম প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পের চরিত্রগুলোকে বুঝতে, আত্মস্থ করতে সাহায্য করে নদী। বিশেষ করে কোনো মানসিক অবস্থার বর্ণনায় নদীর ব্যবহার তাঁর গল্পে চরিত্র-মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যার উপকরণ। প্রসঙ্গত "পাগড়ি" গল্পে লক্ষণীয় :

> ...খানবাহাদুর সাহেব বজরায় বিয়ে করবেন স্থির করলেন। প্রশস্ত যমুনা, ওপারে ধু-ধু চর। মানুষের পদচিহ্ন-খচিত দুনিয়া থেকে দূর জীবনের মতো স্রোতস্বিনী নদীর বুকে বিয়ে করবার মধ্যে একটা প্রতীকী বিশেষত্ব যেন আছে। (পৃ. ৯৫)

এই 'প্রতীকী বিশেষত্ব' বিশ্লেষণের দাবি রাখে। প্রথমত, "পাগড়ি" গল্পে নদী পাঠকের হৃদয়ে এক ধরনের ভাসমান বোধ তৈরি করে; সঞ্চার ঘটায় এক ধরনের অস্থিরতার। তরলের আন্তঃআণবিক শক্তির যে অদৃঢ়তা বৈজ্ঞানিক সত্য, জলের সেই অস্থির স্বভাবকে এই গল্পে পাওয়া যাবে কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপায়ণে। এই অস্থিরতা খানবাহাদুর সাহেবের জীবনের অস্থিরতা। সেইসঙ্গে রয়েছে তাঁর দৃঢ়তার সংকট। তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের কারণ হিসেবে তিনি যতই জীবনের তাগিদকে গুরুত্ব দিতে চান না কেন, মূলত এর আড়ালে রয়েছে যৌনতার তাগিদ। তিনি নিজেই নিজেকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করেন। বিয়েটাকে সামাজিক প্রয়োজন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে আপন মনেই অনেক রকম যুক্তি দেন। একধরনের আত্মপ্রতারণা ঢাকতেই কি তিনি ছদ্ম-সামন্তসাজে বজরায় করে নদীতে বিয়ে করবার কথা ভাবেন? তাঁর মনোকাঠামো পর্যবেক্ষণে যা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো— তাঁর মধ্যে এক ধরনের লিবিডো চেতনা কাজ করছে। আবার এই চেতনাকে তিনি স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত। এই কুণ্ঠার অবভাস হয়ে ওঠে 'যমুনা নদী'। স্মরণ করা যেতে পারে যে, 'যমুনা' নদীর নামের সঙ্গে ভারতীয় শাশ্বত প্রেম-চেতনা জড়িয়ে রয়েছে। এ যেন প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। প্রেমের আর্কেটাইপ যে নদী সেই নদীবক্ষে তিনি বিবাহ সম্পাদনে উন্মুখ অথচ সেখানে প্রেম নেই; আছে ছলনা। আরো আছে ভোগের বাসনা। এত আড়ম্বর এত আয়োজন — যেন তাঁর নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানোরই ব্যর্থ প্রচেষ্টা। আর তাই হয়ত তিনি অনেক কৌশলে পাগড়িটা সাথে নিয়ে গেলেও তা পরিধান করতে পারেননি। জীবনের জৈবিক ক্যানভাসের বিদ্রূপাত্মক প্রেক্ষাপট হয়ে বয়ে যায় যমুনা নদী আর তার বিপরীতে খানবাহাদুরের ব্যবহার-অক্ষম পাগড়ি পেয়ে যায় অচরিতার্থ লিবিডো চেতনার প্রতীকী তাৎপর্য। সর্বোপরি খানবাহাদুর সাহেবের বিবাহযাত্রা আর বধূবরণের মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য শনাক্ত করা যায়। ফেরার পথে নববধূর পাশে বসেও তিনি পাগড়ি পরতে পারেননি। এমনকি খানবাহাদুর সাহেবের নববধূকে যখন তার মানসিক ভারসাম্যহীন স্ত্রী স্বাগত জানায় তখন মূহূর্তের জন্য পাঠকেরও মনে হয়, তার স্ত্রী হয়ত হৃত ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে, এবং এর সূত্র ধরে এক অমীমাংসিত প্রশ্ন জাগে, প্রকৃত মনোবিকার কার ঘটেছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পে নদী কখনো আখ্যানের উপাচার, কখনো ঘটনার পরিণতি আবার কখনো-বা চরিত্র আত্মস্থ করবার অনিবার্য কৌশল। এই মন্তব্যের সমর্থন মিলবে "খুনী" গল্পটির রাজ্জাক চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে :

> একসময়ে সে [রাজ্জাক] হঠাৎ চোখ তুলে ওধারে তাকাল। আদালতের সামনে নদী; সে-নদীর এত অংশে নজর পড়ে দোকান থেকে। এধারে উঁচু খাড়া পাড়, কিন্তু ওপারে বিস্তৃত বালুচর ধু-ধু করে, চিকচিক করে সূর্যালোক। সে-চরের পানে তাকিয়ে সে দেখলো, সেখানে হওয়ায় ধুলো উড়ছে, দেখে তার মন হঠাৎ ছুটতে শুরু করলো। যে-মন বহুদিন ধরে স্তব্ধ হয়ে ছিল, অদ্ভুতভাবে স্থির হয়ে ছিল, সে মন হঠাৎ আবার দিশেহারা হয়ে ছুটতে লাগল, এবং ছুটতে ছুটতে এক স্থানে বালির বাঁধে আছড়ে পড়ল : এবং গভীর নীল পানির জন্য মন তৃষ্ণায় আকুল হয়ে উঠলেও সে বাঁধের ওধারে যেতে পারল না। ("খুনী"; পৃ. ৪০)

এখানে রাজ্জাক খুনি। সে নোয়াখালির আর্দ্র আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছে। বন্ধুকে অকস্মাৎ খুন করে সে নোয়াখালির চর আলেকজান্ডার থেকে পালিয়ে এসে উত্তরবঙ্গের একটি মহকুমা শহরে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু রাজ্জাক পরিশুদ্ধ মানবসত্তার অভিসারী। রাজ্জাক নরম, কোমল স্বভাবের। তার মনে অনুশোচনা হয়। সে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। যাকে সে খুন করেছে তার জন্য বেহেশ্‌ত কামনা করে। রাজ্জাক খুন করলেও তার হৃদয় আপরাধপ্রবণ নয়। সে তার পাপ স্বীকার করে। আবেদ দর্জির কাছে সে অনায়াসে পরিচয় গোপন করতে পারত। কিন্তু রাজ্জাক তা করেনি। উত্তরবঙ্গের রুক্ষ প্রকৃতিতে তার মন তৃষ্ণার্ত হয়। এতদিন রাজ্জাকের মন স্তব্ধ হয়ে ছিল। কিন্তু এখন সেই স্তব্ধ মন ছুটছে নীল পানির জন্য, হাহাকার করছে বালির বাঁধের ওপারে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সে যেতে পারে না। এভাবে প্রাকৃতির অনুষঙ্গ এনে, নদীর জলকে ব্যবহার করে লেখক রাজ্জাককে আরও বেশি মানবিক করে তোলেন। রাজ্জাকের মনে অতীতের একটি দগদগে ঘা থাকা সত্ত্বেও সে অতীত থেকে নির্বাসন চায় না। তাই আবারো নদীর পানির জন্য রাজ্জাক ব্যাকুল হয়। প্রকৃতপক্ষে রাজ্জাক ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করে প্রবহমানতার জন্য; রাজ্জাকের মধ্যে ভিটগেনস্টাইনের সেই জীবনপ্রবাহের অনিবার্য অনিশ্চয়তার বোধকে তখন আবিষ্কার করতে পাঠক উৎসাহী হয়ে ওঠে।

নদীর মতোই বহমান জীবনের ধারাবাহিকতাকে আমরা শনাক্ত করতে পারি "পরাজয়" গল্পে। 'লেখকের নিজস্ব কথাসাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত, হয়তো পরিচিত ও অভিজ্ঞতালব্ধ প্রিয় বিষয় নদী-নৌকা-চর-চরাচরের প্রকৃতি এই গল্পে অধিক জীবন্ত ও বাস্তবময়' (সুশান্ত, ২০১৪, পৃ. ২৯০)। গল্পটি শুরু হয়েছে ধলেশ্বরী নদীতে এক উদ্ভাসিত ভোরের বর্ণনায় :

> দূরে এখানে ধলেশ্বরীর সাথে এই রাঙাধারের ঢালা এক হয়ে মিশেছে, সে সঙ্গমস্থানের বিস্তীর্ণ জলরাশি হঠাৎ ঝলমল করে উঠলো; মেঘের ফাঁকে সকালবেলার সূর্যালোক ঝলকে পড়েছে সেখানে। (পৃ. ১৯)

নদীর প্রেক্ষাপট এই গল্পের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বিস্তৃত থেকেছে। যেন জীবন ক্যানভাসে কোনো চিত্রকর্মের আয়োজন করছে নদী। প্রকৃতপক্ষে 'এই বর্ণনা মনে করিয়ে দেয় ক্লদ মনে'র বিখ্যাত ছবি 'সানরাইজ' এর কথা' (সৈয়দ শাহরিয়ার, ২০১৪ : ২৯৭)। নদীকে ঘিরে লোকায়ত কোনো বোধের পরিবর্তে লেখকের মনোবীক্ষণ কেন্দ্রীভূত হয় আধুনিক পাশ্চাত্য চিত্রকলার অনুভববেদ্য আলো-ছায়ার সমীকরণে। সূর্য-মেঘ সর্বোপরি আকাশের রং প্রতিবিম্বিত হয়ে পরিবর্তিত হচ্ছে নদী — যা দিয়ে "পরাজয়" গল্পে ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্বনির্মিত নদী-দর্শনকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষেই এই গল্পের পুরো প্লট তৈরি করেছে নদী। কুলসুমের জীবনের প্রতিটি বাঁককে লেখক নদীর সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছেন। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় —

> তখন সন্ধ্যা লেগেছে, নদীর নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত বুকে রক্তাভা, আর ওপারের তীররেখা আবছা হয়ে উঠেছে। (পৃ. ২২)

এই সন্ধ্যা মৃত্যুর কালবেলা। সর্প দংশনে ছমিরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার স্ত্রী কুলসুমের পারিবারিক কাঠামো থেকে উন্মুল হবার ক্ষণ। ছমির মিয়ার মৃত্যুর সময়টা সন্ধ্যা; প্রকৃত অর্থেই এ যেন কুলসুমের জীবনের দুঃসময়-দৃশ্য, ম্লান সন্ধ্যা। ছমির মিয়ার মৃত্যু, কুলসুমের একাকিত্ব, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা সর্বোপরি যে মানসিক-অসহায়ত্ব, তার সব কিছু পরিস্ফুট হয় এই সন্ধ্যা প্রতীকে। গল্পকার ম্লান সন্ধ্যা, নিস্তরঙ্গ নদী আর আবছা তীররেখার প্রেক্ষাপটে ছমির মিয়ার মৃত্যু দৃশ্যের বর্ণনা করেন। তাতে করে কুলসুমের ভাবী-জীবনের তরঙ্গভঙ্গের সঙ্গে আনায়াসে পাঠককে যুক্ত করে দেওয়া সম্ভব হয়। এরপর গল্পের প্লটে আসে ছমির মিয়ার বন্ধু মজনু আর কালু। ছমির মিয়ার দেহ নিয়ে তারা গাঁয়ে ফিরবে। কিন্তু দুজনের মনেই জাগে কুলসুমকে ভোগ করার প্রবল বাসনা —

> ওদিকে রোদ খরখর করছে, নদীর বিস্তৃত বুক ঝকঝক করছে : সেদিকে তাকানো যায় না। কিন্তু হঠাৎ দিগন্তরেখা পেরিয়ে মেঘ জাগতে লাগল, এবং তারই ছায়ায় নদীর সে-প্রান্ত উঠল ধূসর হয়ে। এধারে এখনও শান্তি আর নীরবতা: নদীর জল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে একটা মাছরাঙা উড়ে আসছে এদিকে, আর আকাশে ঘুরে ঘুরে উড়ছে শঙ্খচিল। (পৃ.২৩)

কুলসুম একপ্রান্তে আরেক প্রান্তে মজনু ও কালু — যাদের দুজনের মনেই কামনার মেঘ জমছে। কিন্তু কুলসুম তখনো বেহুলার কথা ভাবছে, তার স্বপ্ন দেখা তখনো সাঙ্গ হয়নি। সে তখনও ছমিরকে নিয়ে ভেসে যেতে চায়; নদী তার আশ্রয়, ভরসার জায়গা। কিন্তু মেঘের ছায়ায় যখন নদীর একটি প্রান্ত ধূসর হয়ে ওঠে; যে হাওয়া কুলসুমের চোখের মতো স্তব্ধ হয়ে ছিল সেই হাওয়াও হঠাৎ করে প্রবল হয়ে ওঠে। গল্পকার এখানে মেঘ, নদীর ওপর মেঘের কালো ছায়া — বিবিধ অনুষঙ্গ ব্যবহার করে যেন কুলসুমের অনাগত জীবনের প্রতি কোনো অশুভ ইঙ্গিত করেন। কিন্তু প্রকৃতি সহায় হয় কুলসুমের। এরপরই এক অবিশ্রান্ত বর্ষণ নামে। বর্ষণের ভারে মেঘ কাটে। বৃষ্টিধারা নেমে আসে কামনা-পেরোনো মনুষ্যত্বে উদ্ভাসিত হয়ে। মানবিক বর্ষণে পরাজিত হয় কামনার মেঘ। জয় হয় মানবিকতার —

> কখন বৃষ্টি হঠাৎ ধরে গেছে। ধানের শিষ কাঁপিয়ে নদীতে ঢেউ তুলে জোর শীতল হাওয়া বইতে শুরু করেছে — যে-মেঘগুলো এখনও জমাট হয়ে রয়েছে সেগুলো নিয়ে যাবে ঝেঁটিয়ে, আর এধারে আবার ঝলমল করে উঠবে সূর্যালোক। (পৃ. ২৭)

বৃষ্টি ধরে গেছে। ধানের শিষ যেন জীবনের নতুন স্পন্দনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। জোরে যে শীতল হাওয়া বইছে, তা অবশিষ্ট মেঘগুলোকেও ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাবে। লোভাতুর কামনার ইতি ঘটবে আর তাতেই নদীর এধারে আবারো ঝলমল করে উঠবে সূর্যালোক। এই আলো জীবনের আলো, কুলসুমের আলোকিত জীবনের জয় হয়েছে। এই উদাহরণগুলো বিশ্লেষণ করে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কুলসুমের জীবনটা নদীর সঙ্গে একটা সাদৃশ্য তৈরি করে। কুলসুমের মাচা নদীর ওপরে। মাচাটা স্থির কিন্তু নিচে যে নদী প্রবহমান তা গতিময়তাকে ধারণ করে আছে। লেখক নদীর বহমান ধারার মধ্যে কুলসুমকে মিশিয়ে দিয়েছেন। ফলে পুরো ছবিটা শেষ পর্যন্ত আর বস্তু হয়ে থাকছে না অনুভবে রূপান্তরিত হচ্ছে; নদী আর মানব মন একীভূত হয়ে উঠছে মানবিক শুদ্ধ বোধে।

৬.

এভাবে বিভিন্ন গল্পে ওয়ালীউল্লাহ্‌র নদী-দর্শনকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। নদীকে উপায় হিসেবে গ্রহণ করে তিনি তাঁর চিন্তাকে নির্মাণ করেছেন। শিল্পঋদ্ধ এই নির্মাণের পরতে পরতে পাঠক পেয়ে যায় নদীর জল-হাওয়ার স্পর্শ। তবুও নদীর নিসর্গকে কিংবা সমাজ-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে এসব গল্পে মুখ্য হয়ে উঠেছে নদীর দার্শনিক মাত্রা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পের নদীকে আমরা পাই বিভিন্ন চরিত্রের বির্মূত মনোজগতের সঙ্গী হিসেবে। একইসঙ্গে গল্পকার নদীকে ব্যবহার করেন মানব স্বভাবের সূচক হিসেবে, আবার কখনো-বা নদী উপস্থাপিত হয় জীবন-পরিব্রাজকের দ্যোতকে। মানবচেতনা প্রবাহ আর নদীর বয়ে চলাকে একই ধারায় সংজ্ঞার্থ প্রদান করে গল্পকার সঞ্চার করেন টিকে থাকার চিরায়ত প্যাশন-কে। আবার বৈশ্বিক সংকট কিংবা সমকালীন সংকট থেকে শুরু করে মানবিকতার অবক্ষয়, মানুষের মনোজৈবনিক চেতনার প্রকাশ ঘটান তিনি নদীর অনুষঙ্গে। কেননা, নদী এমন একটি বহমান প্রপঞ্চ যা জীবনের বহমানতার সঙ্গে একাত্ম। তাই ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পে নদী কখনো-কখনো জীবনের অন্য নাম। এরই সূত্র ধরে বলা যায়, ওয়ালীউল্লাহ্‌-গবেষণায় নদী অনুষঙ্গ আরও ব্যাপক অনুসন্ধানের দাবি রাখে। বিশেষ করে "মাঝি", "না কান্দে বুবু" প্রভৃতি অগ্রন্থিত ছোটগল্পে রয়েছে নদীর আরও বহুমুখী ও বিচিত্র সাংকেতিক প্রয়োগ; পূর্ব-নির্দেশিত পরিসীমাভুক্ত না হওয়ায় এরা বর্তমান বিশ্লেষণের বাইরে রয়ে গেল। তবে, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে, নদীর এরূপ বহুমাত্রিক রূপায়ণের বিশ্লেষণ হয়ে উঠতে পারে সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে নতুনভাবে আবিষ্কারের চাবিকাঠি।

গ্রন্থপঞ্জি

আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌ (২০১২)। *আমার স্বামী ওয়ালী* (শিবব্রত বর্মন অনুদিত), ঢাকা : প্রথমা।

জীনাত ইমতিয়াজ আলী (২০০১)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ : জীবন দর্শন ও সাহিত্যকর্ম*, ঢাকা : নবযুগ।

শেফালী মৈত্র (২০১১)। 'নৈতিক তবুও অনিশ্চয় : সিমোন দ্য বোভোয়ার নীতি-দর্শন'; *সিমন দ্য বোভোয়ার*, বীতশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা : এবং মুশেয়ারা, পৃ. ৪৭-৬২

সুশান্ত মজুমদার (২০১৪)। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌'র আধুনিকতা ও নয়নচারা, *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা-৬

সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান (২০১৪)। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌'র গল্পে রঙের দ্যোতনা, *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা-৬

Hesse, Hermann (1973). *Siddhartha*, Madras : Macmillan India Press.

James, William (1890). *The Principles of Psychology*. ed. George A. Miller, Harvard : Harvard University Press.

Kahan, Charles (1979). *The art and the thought of Heraculitus: Fragments with translation and commentary*. London : Cambridge University press.

Plato (1871). *The dialogues of Plato* (Cratylus). Translated by Jowett, Benjamin. New York : Macmillan and co.

Wittgenstein, Ludwig (1953). *Philosophical Investigations*, London : Blackwell Publishing.

* বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিসমূহ বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত এবং সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ রচনাসমগ্র-২য় খণ্ড* থেকে নেয়া হয়েছে।